যোগাযোগের ক্ষেত্রে নয়া 'অবতার'

ড. এহসান হক

একটি রোবট মানুষের ভাষা, মুখভঙ্গি, ইশারা ইত্যাদি বুঝে তার সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে, এমন গবেষণায় সফলতা পেয়েছেন ড. এহসান হক। তাঁর গবেষণা অটিস্টিক ব্যক্তিদের চিকিৎসায় কাজে লাগবে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব রচেস্টারের কম্পিউটার বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক এহসান। এ বছরই ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মিডিয়া ল্যাব থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তাঁকে নিয়ে আজকের স্পটলাইট

লেখা ও সাক্ষাৎকার : **চন্দন চৌধুরী**



নিজের তৈরি অবতারের সঙ্গে কথা বলছেন এহসান

ছোটবেলায় মা তাঁকে একটি বই কিনে দিয়েছিলেন, 'মনীষীদের কথা'। সেটিতে সাহিত্যিক, কবি, বিপ্লবী, বিজ্ঞানীদের জীবনের ঘটনা ছিল। বইটি পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন, অধিকাংশ মনীষীর জীবনের শুরুটাই ব্যর্থতা দিয়ে। তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের প্রতি আস্থা হারাননি। চেষ্টা করে গেছেন ক্রমাগত। সেই ফেলটুসদের মতোই একজন এহসান হক। লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন না। ছিলেন অসম্ভব দামাল। স্কুলে থাকতে খেলার মাঠে হাত ভেঙেছেন। পা-ও বাদ যায়নি। সেটিও ভেঙেছেন একবার। দীর্ঘ সময় খেলার জন্য শাস্তিও পেয়েছেন অনেক। কিন্তু দস্যিপনা কমেনি। আদরের সঙ্গে ছেলেকে শাসন করতেও ছাড়েননি মা। এহসান অনেক সন্ধ্যায় বাসায় এসে দেখতেন, দরজায় তালা ঝুলিয়েছেন মা। ঘরে প্রবেশ করতেন এশার সময়, বাবার বাসায় ফেরার পর।

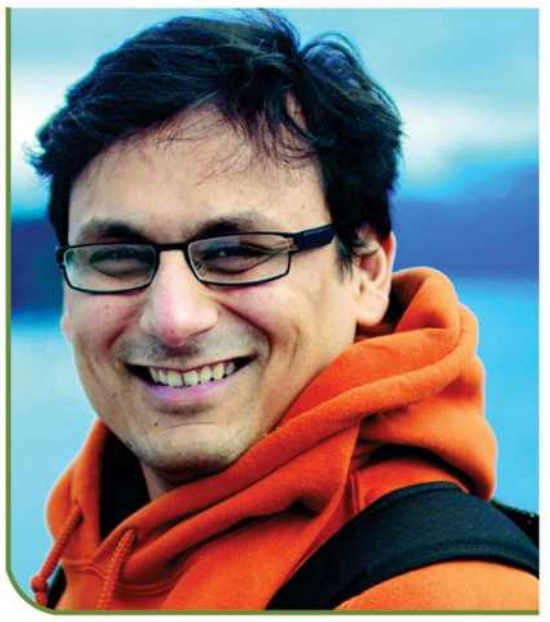
অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে ওঠার সময় ফেল করলেন ইংরেজি প্রথম পত্রে। লজ্জায় আর দুঃখে পালালেন বাসা থেকে। এক রাত কাটান যাত্রাবাড়ীর এক মসজিদে। বাড়ি ফিরেছিলেন পরের দিন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ১০ নম্বরের গ্রেস দেওয়ায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন নবম শ্রেণীতে। সেখানে তাঁর রোল ছিল ৬৩, যেটি ক্লাসের সর্বনিম্ন। এখন এহসান মনে করেন, 'ওই ধাক্কাটা জীবনে খুব প্রয়োজন ছিল। আমার মনে হয় জীবনে একবার সবারই ধাক্কা খাওয়া উচিত।'

এহসান হকের জন্ম পুরান ঢাকার নারিন্দায়। বাবা এনামুল হক বাবুল, মা লুতফে শাবা। এহসানের শৈশবের একটা বড় সময় কেটেছে টিকাটুলিতে। নার্সারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন উদয়ন স্কুলে। প্রথমে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলেন সেন্ট গ্রেগরি বিদ্যালয়ে। উত্তীর্ণ হতে পারেননি। পরে 'ডোনেশন' দিয়ে ভর্তি করানো হয় উদয়ন স্কুলে। দশম শ্রেণীর পর প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন নটর ডেম কলেজে। ভর্তি হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই দুই বন্ধুর প্ররোচনায় নটর ডেম বাদ দিয়ে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। কলেজে ক্লাস করার চেয়ে বেশি খেলেছেন টেবিল টেনিস। তবে নেশা ছিল বিজ্ঞানের প্রতি। কয়েকজন মিলে গড়ে তুলেছিলেন ঢাকা কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব। ১৯৯৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করার পর শুরু হয় প্রবাস জীবন।

২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পেন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। সেখানে তিনি পান বেস্ট সিনিয়র ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড। এরপর ভর্তি হন ইউনিভার্সিটি অব মেমফিসে। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল, 'হোয়াট স্পিচ টেলস আস অ্যাবাউট ডিসকোর্স : দ্য রোল অব প্রসোডিক অ্যান্ড ডিসকোর্স ফিচারস ইন ডায়ালগ অ্যাট ক্লাসিফিকেশন।' ২০০৭ সালে লাভ করেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ২০১৩ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মিডিয়া ল্যাব থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। গবেষণা করছেন মানুষ এবং যন্ত্রের সম্পর্ককে বাস্তবে রূপ দেওয়ার বিষয়ে।

উদ্ভাবনের আলো

২০১১ সালের কথা। নিউ ইংল্যান্ডের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির এমআইটির পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত ছিলেন ড. এহসান। উদ্বোধনের পরেই ছিল তাঁর বলার পালা। মঞ্চে উঠে দিলেন নিজের গতানুগতিক ধারার বক্তব্য। বেশ উৎসাহ নিয়েই বললেন, 'আমরা চাই কম্পিউটার মানুষের মতো বুদ্ধিমান হোক। আমরা যেমন একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারি, সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করতে পারি, একদিন যন্ত্রের সঙ্গেও আমরা ঠিক একই কাজ করতে পারব। ছেলেবেলার সেই রঙিন সায়েন্স ফিকশন বাস্তবে পরিণত হতে আর বেশি দেরি নেই।' এমন বক্তৃতার পর একজন মধ্যবয়স্ক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'দেখো, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমি নার্ভাস হয়ে যাই, বুকটা ধড়ফড় করে। চোখের পরিবর্তে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকি। অনেক সময় কথা বলা শুরু করলে বুঝতে পারি না যে অনেক বেশি কথা বলছি। তাই হয়তো পরিচিত লোকজন আমাকে দেখে কাজের ভান করে পালিয়ে যায়। পেছনে পেছনে বলে বাচাল, আবার কখনো অসামাজিক। আমার খুব ইচ্ছা, আমার এই অভ্যাসটুকু বদলাব, যাতে মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারি, সহজেই সবার বন্ধু হতে পারি। কিন্তু কার কাছে সাহায্য চাইব? অন্য কারো কাছে সাহায্য চাইতেও লজ্জা বোধ হয়। তোমরা সায়েন্স ফিকশনকে বাস্তবতায় পরিণত করার চেষ্টা করছ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, সেটা খুবই চমৎকার। কিন্তু সেই সঙ্গে কি তোমাদের এই প্রযুক্তি আমাদের কোনো কাজে আসতে পারে? বিজ্ঞান যদি মানুষের কাজে না আসে, তাহলে সেই বিজ্ঞান দিয়ে আমার কী লাভ?' প্রশ্নকর্তার এমন কথা শুনে ক্ষণিক দমে যান এহসান। তবে ধন্যবাদ দিতে ভুলেন না। এরপর এই বিষয়টি তাঁর মাথায় ঢোকে। তাই তো, বিজ্ঞান যদি কাজেই না লাগে, তাহলে কী লাভ। চিন্তা করে ঠিক করলেন



কম্পিউটারে এমন একটা কার্টুন বানাবেন, যা কিনা দেখতে অবিকল মানুষের মতো এবং কথাবার্তাও ঠিক মানুষের মতন। নাম দেন 'অবতার'।

যেভাবে কাজ করে 'অবতার'

কম্পিউটারের ভেতর বসে থাকা একটা কার্টুন কম্পিউটারের বাইরের জগতের কাউকে কেমন করে চিনবে, জানবে বা শুনবে? কিংবা এটা করেই বা মানুষের কী লাভ? এহসান বলেন, 'এটা যন্ত্রকে মানুষের কাছাকাছি করার একটা উপায়। অনেকেই মানুষের সংস্পর্শে আসতে আগ্রহী, কিন্তু জানে না কী করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। যেমন ক্লাসরুমের ভেতর মাথাভর্তি প্রশ্ন কিলবিল করা সত্ত্বেও অনেকেই প্রশ্ন করতে ভয় পায় বা ইতস্তত বোধ করে। ভাবে, প্রশ্নটা যে করব লোকে কী ভাববে? শিক্ষক খেপে গিয়ে আমাকে অপমান করবেন না তো? এটি এসব ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে মানুষকে।'

কম্পিউটারের সঙ্গে অনুশীলন করার একটা বড় সুবিধা হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করলেও কম্পিউটার কখনো বিরক্ত হবে না, কম্পিউটারকে একই প্রশ্ন বারবার করলেও তার গলার স্বর কখনো উঁচু হবে না, ভ্রুতে ভাঁজ পড়বে না। শুধু তা-ই নয়, কথোপকথনের ব্যাপারে সাহায্য করতে হলে, কম্পিউটারের পক্ষে আমাদের মুখাবয়ব, কথা, কণ্ঠ, গলার স্বর, ভাবভঙ্গি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া সম্ভব, যেটা মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব না।

এসব ভাবতে ভাবতে কাজে লেগে যান এহসান। প্রায় এক বছর গাধার মতো খেটে প্রযুক্তিগতভাবে সামান্য উৎকর্ষ সাধন করে কিছু একটা দাঁড় করালেন। শেষে একটা অবতার তৈরি হলো, যে কিনা ওয়েবক্যাম দিয়ে মানুষের মুখাবয়ব বিশ্লেষণ করতে পারে, মানুষটি হাসলে অবতারটিও হেসে ওঠে। মানুষ কথা বলা শুরু করলে কথাগুলো বুঝতে পারে, প্রয়োজনে দরকারি জায়গাগুলোয় মাথা নাড়িয়ে সম্মতি প্রকাশ করে। নিজের উদ্ভাবনকে মূল্যায়ন করার জন্য প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করলেন চাকরির সাক্ষাৎকার। গবেষণায় দেখা গেছে যে শিক্ষাগত বৃত্তান্তের ওপর ভিত্তি করে মানুষকে চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। কিন্তু চাকরির সাক্ষাৎকারে তার ব্যবহার ও পারস্পরিক আচরণের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঠিক করলেন, অবতারটি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করবে আর প্রশ্ন করে যাবে। গবেষণার পর প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে নিজেই অবাক হলেন। দৌড়ে গেলেন নিজের পিএইচডি সুপারভাইজার অধ্যাপক রোজালিন্ড পিকার্ডের অফিসে। তিনি এহসানের বিশ্লেষণ দেখে পিঠে একটা থাবা দিয়ে বললেন, 'আমি ১৫ বছর ধরে যে সমস্যাটির সমাধান করতে চেয়েছিলাম, তুমি তোমার পিএইচডির গবেষণার মাধ্যমে তার সমাধান করলে। তুমিই প্রথম দেখালে যে যন্ত্রের সঙ্গে অনুশীলন করে মানুষের পক্ষে তার পারস্পরিক ব্যবহারের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।'

পুরস্কারও এলো

নিজের উদ্ভাবনটি পাঠিয়ে দিলেন 'উবিকুইটাস কম্পুউটিই' নামের এক সম্মেলনের জন্য। এতে পৃথিবীর বাঘা বাঘা গবেষকরা তাঁর কাজের ফলাফল যাচাই করতে পারবেন। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অচিরেই একটা ই-মেইল এলো। প্রায় ৪০০টি গবেষণাপত্রের মধ্যে এহসানের কাজটিকে সে বছর শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সম্মেলনের প্রধান ব্যক্তিগত ই-মেইলে বলেছেন, 'তুমি শুধু বিজ্ঞানকেই সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওনি, পাশাপাশি বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক আচরণকে উন্নত করার একটি নতুন সম্ভাবনাকে সামনে তুলে এনেছ। আমরা আশা করছি, তোমার এই কাজের মাধ্যমে অন্য গবেষকরাও এ ধরনের কাজ করতে আগ্রহী হবেন।' সৌভাগ্যবশত সেই মধ্যবয়স্ক লোকটির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল এহসানের। পরিচয় দিয়ে লোকটিকে ধন্যবাদ দিলেন। জানালেন তাঁর মতামত নিজের পিএইচডি গবেষণাকে প্রভাবিত করেছে। অন্য কারোর চোখে চোখ মেলাতে কষ্ট হয় ভদ্রলোকটির। তার পরেও, কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে এহসানের চোখের দিকে তাকিয়ে হাতটা জড়িয়ে ধরলেন, মুখে কিছু বললেন না।

আমেরিকায় বাঙালি ব্লগার

পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নালে ছাপা হয়েছে এহসানের ৪০টির মতো গবেষণাপত্র। তবে শুধু যে ইংরেজিতে লিখেন এমন নয়, বাংলা ব্লগেও লিখতে ভালোবাসেন ড. এহসান। সেখানে বিজ্ঞান ও নিজের জীবন নিয়েও লিখেছেন বেশ কয়েকটি লেখা। এহসানরা তিন ভাই এক বোন। বড় বোন লুনা থাকেন কানাডায়। এহসান মেজো, ছোট ভাই ইশতেহার থাকেন ঢাকায়। মা লুতফে শাবা, মারা গেছেন ২০০৮ সালে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে। বাবা এনামুল হক বাবুল, ধানমণ্ডিতে থাকেন। স্ত্রী নাফিসা আলম এবং একমাত্র ছেলে ওয়ালি ইহানকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ড. এহসান।

হক কথা

তোতলা হক

ছোটবেলায় ছিলেন তোতলা। শিশু একাডেমিতে 'সঠিক বাংলা উচ্চারণ' ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন মা। সঙ্গে কিনে দিয়েছিলে গ্রিক বিতার্কিক ডেমনস্থিনিসের জীবনী। ডেমনস্থিনিস ছিলেন তোতলা। মুখে মারবেল নিয়ে কথা বলা অনুশীলন করতেন। এভাবে অনুশীলন করতে করতে শতাব্দীর সেরা তার্কিকে পরিণত হয়েছিলেন। সঠিক বাংলা উচ্চারণ ক্লাস থেকে সামান্য ছিটেফোঁটা উন্নতি হয়েছিল, আর তাতেই স্কুলের বিতর্ক দলে ঢোকার স্বপ্ন দেখেছিলেন এহসান। সুযোগ মেলেনি, তার পরেও আশাহত হননি। তবে পেন স্টেটে আন্ডারগ্রেড থাকাকালীন ইউনিভার্সিটির বিতর্ক দলে সুযোগ মিলেছে ঠিকই।

'একটা রসগোল্লা দেন'

ডরচেস্টার শহর। বোস্টন থেকে ১২ মাইল। সেখানে কয়েকটি বাংলাদেশি দোকানে বেশ রমরমা ব্যবসা। তবে এলাকার কিছু পাতি-মাস্তান বিদেশি দেখে দোকানদারদের ওপর অত্যাচার করত। টাকা না দিয়ে পণ্য নিয়ে চলে যেত। বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা ইংরেজিতে দক্ষ না হওয়ায় পুলিশকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারছিল না। এলাকার কিছু দরদি লোক এদের সাহায্য করার জন্য এহসানদের ভার্সিটির বাংলাদেশিদের ই-মেইল খুঁজে বের করে সাহায্য চান। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এহসান গেলেন ডরচেস্টার শহরে। গিয়ে দেখেন হোমরাচোমরা এক গোয়েন্দার সামনে বসে আছে তিন গোবেচারা বাংলাদেশি দোকানদার। গোয়েন্দা একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে, আর বাংলাদেশিগুলো ভয়ার্ত চেহারায় শুধু বলে যাচ্ছে 'আই ডোন্ট নো'। এরপর এহসানের কথায়ই সমস্যার উত্তরণ হলো। বিদায় নেওয়ার সময় দোকানিরা উপুড় হয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাইজান, বাসার জন্য সদাইপাতি কিছু লাগব?' এহসান তাঁদের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা শক্ত করে ধরে বললেন, 'একটা রসগোল্লা দেন।'



‘একদিন কম্পিউটারও মানুষের মতো বুঝতে এবং শিখতে পারবে’

ছোটবেলায় কী হতে চেয়েছিলেন? মা-বাবা কী চেয়েছিলেন?
আমার মা-বাবা কখনোই আমার ভবিষ্যতের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাননি। পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য কর্মকাণ্ডেও অনেক উৎসাহ দিয়েছেন। শিশু একাডেমিতে চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয় ও তবলা বাজানোর ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কোথাও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছে শুনলেই আমার নাম লিখিয়ে দিতেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেও পুরস্কার তেমন একটা মিলত না। মন খারাপ হলেও বুঝে নিয়েছিলাম, অসফলতার মাঝে উদ্যম না হারিয়ে চেষ্টা করে যাওয়াটাই হচ্ছে প্রকৃত সফলতা।

জীবনে কখন প্রথম বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হলেন?
বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় সেই প্রথম শ্রেণী থেকেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে বিজ্ঞানের মতো একটা মজার বিষয়কে অনেকটা রসকষহীনভাবে পরিবেশন করা হয়। তাই বিজ্ঞান পড়তে একদমই ভালো লাগত না। বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি সপ্তম শ্রেণীতে আমাদের স্কুলের বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। কয়েকদিন পরিশ্রম করে একটা বিদেশি বই পড়ে নিজের হাতে বানিয়েছিলাম একটা কলিংবেল (তখন ইন্টারনেট ছিল না, তাই তথ্য খুঁজে বের করা ছিল খুব মুশকিল)। আমার বাবা ইলেকট্রনিক্সের খুচরা যন্ত্রপাতির ব্যবসা করতেন। সেই সুবাদে প্রয়োজনীয় সব কিছু হাতের নাগালেই ছিল—সোডারিং আয়রন থেকে শুরু করে সার্কিট বোর্ড—সব কিছু। উল্টাপাল্টা ওয়্যারিং করে কয়েকটা সার্কিট বোর্ড জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। ওই অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছিলাম যে ভুল না করে নতুন কিছু শেখা বা বানানো সম্ভব নয়।
ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে জানতে পারলাম এখানে কোনো বিজ্ঞান ক্লাব নেই। তাই আমরা কয়েকজন মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম ঢাকা কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব। বিজ্ঞান ক্লাবের প্রথম স্মরণিকাটি আমার সম্পাদনা করা।

প্রথমে তো আপনি নটর ডেম কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন?
নটর ডেম কলেজে ভর্তি হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই আমার দুই বন্ধুর প্ররোচনায় নটর ডেম বাদ দিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম ঢাকা কলেজে। ১৯৯৬ সাল। কাগজপত্র জমা নিচ্ছিলেন ঢাকা কলেজেরই এক শিক্ষক। স্যারকে খুশি করার জন্য দাঁত বের করে বললাম, 'স্যার, নটর ডেম কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। ওদের অ্যাডমিশন বাদ দিয়ে এখানে ভর্তি হলাম। স্যার বিরস মনে বললেন, 'এই তো কপালটা পুড়াইলা। এইখানে তো ক্লাস করবা না একটাও। সারা দিন ঘুইরা বেড়াইবা।' স্যারের কথাটি পরবর্তী সময়ে পুরো ফলেছিল।

কখন বিদেশ গেলেন? এখন যা করছেন, বাংলাদেশে থাকলে কি সম্ভব হতো?
দেশ ছাড়ি ১৯৯৯ সালে, এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে। দেশে থাকলে হয়তো এখন যা করছি, তা করার সুযোগ পেতাম না। তবে সব কিছুরই একটা মূল্য আছে। দেশের বাইরে এক যুগেরও বেশি সময় থেকে মা-বাবার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি, সে ক্ষতিটাও অপূরণীয়।


ক্যাম্পাসে বাংলাদেশিদের নিয়ে নাটকের অভিনয়ে

বিদেশে মানিয়ে নিতে কষ্ট হয়েছিল?
প্রথম বছরটা ছিল অনেক কষ্টের। ছাত্রাবাসে থাকতাম। আমেরিকান খাবারে একদম মন ভরত না। আইসক্রিম খেয়ে পেট ভরাতাম। ইংরেজিতে কথা বলতে পারলেও কথার পিঠে চটুল করে কথা বলতে পারতাম না। সারা জীবন পড়াশোনা করে এসেছিলাম বাংলা মাধ্যমে। ইংরেজিতে পড়তে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রথম সেমিস্টারে ফলাফল ছিল খুবই খারাপ, পেয়েছিলাম জিপিএ ১.৪। পরে অনেক খেটে ওই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসতে হয়েছিল।

এখন যেখানে আছেন সেখানকার পরিবেশ কেমন?
ছোট্ট একটি শহরে থাকি। অল্প কিছু বাংলাদেশি আছে। সপ্তাহান্তে আড্ডা আর বাংলাদেশি খাবারদাবার। বাংলাদেশের খেলা থাকলে সব কিছু বাদ দিয়ে আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশের জার্সি পরে খেলা দেখি।

বাংলাদেশের অনেক তরুণ এখন বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছে। তাদের কী করা প্রয়োজন বলে মনে করেন?
সবাইকে অনুরোধ, ক্লাসরুমের গতানুগতিক ধারার কাজের পাশাপাশি নতুন কিছু করার চেষ্টা করতে হবে।
যে কাজগুলো খুব কঠিন এবং যে কাজে অসফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সেই কাজগুলো তোমাদের করতে হবে। অসফল হলেও অনেক কিছু শিখতে পারবে। কিন্তু একবার যদি সফল হও, তাহলে আর কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?
আমি চাই আমরা যেমন একে অপরের অনুভূতিগুলো বুঝতে পারি—কম্পিউটারও কোনো এক সময় আমাদের মানুষের মতো বুঝতে এবং শিখতে পারবে।

অবসরে কী করেন? বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে?
অবসর তেমন একটা পাই না। ছুটি পেলে চেষ্টা করি বাংলাদেশ নিয়ে ভার্সিটিতে অনুষ্ঠান করতে। একবার এমআইটিতে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম। বাংলাদেশের কথা প্রতিদিন মনে পড়ে। অফিসে বসে প্রতিদিন বাংলা রেডিও শুনি। বাসায় এসে বাংলা চ্যানেলে বাংলাদেশের খবর দেখি।

বাংলাদেশের কোনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়? বন্ধুদের সঙ্গে কোনো মজার ঘটনার কথা মনে পড়ে?
ঢাকা কলেজে পড়ার সময় একবার আমরা তিন বন্ধু একসঙ্গে মাথা কামিয়ে ফেলি। অঙ্ক ক্লাস থেকে বের হয়ে হঠাৎ মনে হলো, জীবনটা খুব বাঁধাধরা এবং একঘেয়ে। রাস্তার ওপাশেই ছিল একটা সেলুন। মাথা কামিয়ে ফেললাম। বাসায় গিয়ে হয়েছিল এক তুমুল কাণ্ড। আমার মা ভেবেছিলেন রাস্তায় কোনো মেয়েকে দেখে শিস বাজিয়েছি দেখে লোকজন আমার মাথা কামিয়ে দিয়েছে। সেই বন্ধুদের খুব মিস করি।

প্রিয় শিক্ষক সম্পর্কে বলুন
পঞ্চম শ্রেণীর একটি পরীক্ষা। সারা রাত জেগে ছাদ ফাটিয়ে ষড়ঋতু রচনা মুখস্থ করেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষায় এলো শীতকাল। অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম কী করব, ষড়ঋতুকে সংক্ষেপে শীতকাল বানিয়ে ফেলব, নাকি অন্য কোনো বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বানাব। অনেক চিন্তার পর সাহস করে 'আমার শৈশব কাল' বিষয়ে একটি রচনা বানিয়ে ফেললাম। কাঁচা হাতের লেখা, তার পরেও বাংলা ম্যাডাম কেয়া আপা আমাকে সবচেয়ে বেশি নম্বর দিলেন। আমার লেখা রচনাটা ক্লাসে সবাইকে পড়ে শোনালেন। আমাকে বললেন, সবসময় এভাবেই স্বকীয় লেখা লিখবে। সেদিন থেকে মুখস্থ করার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলাম। ম্যাডাম সেদিন স্বকীয়তার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন দেখে হয়তো আজও সৃজনশীল কাজে অনুপ্রেরণা পাই।

বাংলাদেশে কিছু করার ইচ্ছে আছে? এ দেশ নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী?
কাজ করার অনেক ইচ্ছা। সমস্যা হচ্ছে পরিচিত ক্ষেত্র এবং সহকারী খুঁজে বের করা। বাংলাদেশে মেধার অভাব নেই। এই মেধাকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে এবং এর দায়িত্ব আমাদের সবার।

বাবা বলে কথা

পহেলা মে ২০১১। রাত প্রায় ১১টা। সারা বিশ্বের মানুষের চোখ টিভিতে। ১০ বছর ধরে ফেরারি লাদেন নাকি ধরা পড়েছে। তাকে নিয়ে সবার মনে কত প্রশ্ন—কী করে ধরা পড়ল, কোথায় লুকিয়েছিল এত দিন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এখন আমেরিকায় ইসলাম নিয়ে বাড়াবাড়ি কমবে তো? কিন্তু এসব প্রশ্ন এহসানের মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটছিল না। কারণ তিনি যে বাবা হতে চলেছেন। সে রাতে নিজেই কাঁপা হাতে নবজাতকের নাভির 'এম্বিলিকাল কর্ড' কেটে পৃথিবীতে স্বাগত জানান।

মাতৃত্বের কোনো মৃত্যু নেই

একদিন বাইরে থেকে হন্তদন্ত হয়ে বাসায় ফেরেন এহসানের মা। বাসার যাবতীয় খাবার একটা টিফিন ক্যারিয়ারে ভরলেন। কাজের ছেলেকে ডেকে বললেন, '৫ ব্লক দূরে পথে একজন ভিক্ষুক ক্ষিধার জ্বালায় চিৎকার করছে। এখুনি রিকশা নিয়ে খাবারগুলো দিয়ে আয়।' তারপর খেয়াল হলো, খাবারের সঙ্গে পানি দেওয়া উচিত। হাতের কাছে কোনো পানির বোতল খুঁজে পেলেন না। সামনে পড়ল এহসানের স্কুলে নিয়ে যাবার ফ্লাস্ক। মা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই রকম আরেকটি কিনে দেব বাবা।' মা লুতফে শাবা, মারা গেছেন ২০০৮ সালে। প্রবাসে বসে এহসানের খুব মনে পড়ে এমন মানবদরদি মায়ের কথা।



ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে